POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ○

‘হে আমার প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।’

(আলে ইমরান, আয়াত: ৩৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 11

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 14 মার্চ, 2019 6 রজব 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

এই পৃথিবী তো কষ্টভোগের স্থান ভিন্ন আর কি কোন মূল্য রাখে? সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজের গুণাবলী গোপন রাখে এবং নিজেকে প্রদর্শনকামিতা থেকে রক্ষা করে। সেই সমস্ত মানুষ, যাদের কর্ম কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তারা নিজেদের কর্ম অপরের নিকট প্রকাশ করে না। এরাই মুত্তাকি।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মুত্তাকির সঙ্গে শয়তানের চিরকাল যুদ্ধ লেগে রয়েছে, কিন্তু যখন সে পুণ্যবান হয়ে যায় তখন যাবতীয় যুদ্ধের অবসান ঘটে। যেমন প্রদর্শনমুখিতা-মানুষ সারা দিন এরই সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। মুত্তাকি এমন এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আছে যেখানে সব সময় যুদ্ধ চলছে। যদি আল্লাহ্‌র কৃপার হাত তার উপর থাকে তবে সে বিজয় লাভ করে। প্রদর্শনকামী ব্যক্তি পৃথিবীতে পিঁপড়ের মত চলাফেরা করে। অনেক সময় মানুষ অজ্ঞাতসারেই হৃদয়ে প্রদর্শনকামিতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দিয়ে বসে। যেমন কোন ব্যক্তি নিজের একটি ছুরি হারিয়ে ফেলে আর কাউকে তার সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। এক্ষেত্রে যাকে ছুরির জন্য জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে যদি মুত্তাকি হয়, তবে সে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। শয়তান তার মনে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে যে, এইভাবে জিজ্ঞাসা করা তার অসম্মান। এরফলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উত্তেজিত হওয়া এবং তাদের মধ্যে তর্কবির্তক আরম্ভ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে একজন মুত্তাকি ব্যক্তি নিজের মন্দ বাসনার সঙ্গে লড়াই করে। যদি সেই ব্যক্তির মধ্যে কেবল আল্লাহ্‌র কারণে সততা থাকে, তবে উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? কেননা, সততা যত গোপন রাখা যায় ততই মঙ্গল। যদি কোন রত্নব্যবসায়ী পথে ডাকাতদলের সম্মুখীন হয় আর তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করে ধারণা করে যে রত্নব্যবসায়ী অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি বা তাদের মধ্যে কেউ তাকে নিঃস্ব মনে করে। তবে তুলনামূলকভাবে রত্নব্যবসায়ী তাকেই পছন্দ করবে যে তার নিঃস্ব হওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছে।

পুণ্যকর্ম গোপনীয় থাকাই উত্তম

এই পৃথিবী কষ্টভোগের স্থান ভিন্ন আর কি কোন মূল্য রাখে? সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজের গুণাবলী গোপন রাখে এবং নিজেকে প্রদর্শনকামিতা থেকে রক্ষা করে। সেই সমস্ত মানুষ, যাদের কর্ম কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তারা নিজেদের কর্ম অপরের নিকট প্রকাশ করে না। এরাই মুত্তাকি।

আমি তাযকেরাতুল আওলিয়া-য় পড়েছি যে, এক সম্মানীয় ব্যক্তি এক জনসমাবেশে কিছু অর্থ যাচনা করে যা তার প্রয়োজন ছিল। কেউ যেন তাকে সাহায্য করে। এক ব্যক্তি তাকে পুণ্যবান মনে করে এক হাজার টাকা দেয়। সেই ব্যক্তি টাকা হাতে নিয়ে সাহায্যকারীর বদান্যতা ও মহানুভবতার প্রশংসা করে। এতে সেই সাহায্যকারী ব্যক্তি বিষন্ন হয়ে পড়ে, একথা ভেবে যে, সে হয়তো পরকালের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হল, কেননা, এই ব্যক্তি তো এখানে লোকের সামনেই আমার প্রশংসা করে বসল। তাই সে কিছুক্ষণ পর এসে বলল, সেই টাকা তার মায়ের ছিল যা সে দিতে ইচ্ছুক নয়। সেই টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হয়। এতে এক ব্যক্তি তাকে ধিক্কার জানাল। এবং বলল, মিথ্যা কথা, আসলে সে নিজেই এই টাকা দিতে ইচ্ছুক নয়। সন্ধ্যায় সেই সম্মানীয় ব্যক্তি যখন ঘরে ফিরে এল, সেই সাহায্যকারী ব্যক্তি হাজার টাকা তার কাছে নিয়ে এসে বলল, আপনি জনসমক্ষে আমার প্রশংসা করে আমাকে পরকালের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই কারণে আমি অজুহাত দেখিয়েছিলাম। এই নিন, টাকা এখন আপনার। কিন্তু আপনি কাউকে আমার নাম বলবেন না। সেই সম্মানিত ব্যক্তি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন এখন তো কিয়ামত পর্যন্ত তোমাকে মানুষের ধিক্কার ও নিন্দা সহ্য করতে হবে। কেননা, সকলে গতকালকের ঘটনা জানলেও, একথা কেউ জানে না যে তুমি টাকা আমাকে ফেরত দিয়েছ।

একজন মুত্তাকি ব্যক্তি পুণ্যকর্ম গোপন রাখতে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যা তাকে অবাধ্যতা করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদা সব সময় তাদের গোপন পুণ্যকর্ম প্রকাশ করে দেন। যেরূপে এক দুর্বৃত্তপরায়ন ব্যক্তি কোন মন্দ কর্মের পর আত্মগোপন করতে চায়। অনুরূপে একজন মুত্তাকি ব্যক্তি লুকিয়ে নামায পড়ে এবং পাছে কেউ দেখে না ফেলে সেই ভয়ে তটস্থ থাকে। প্রকৃত মুত্তাকি এক প্রকারের গোপনীয়তা পছন্দ করে। তাকওয়ার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। কিন্তু তাকওয়ার জন্য সংগ্রাম ও সাধনা প্রয়োজন। মুত্তাকি সর্বক্ষণ লড়াই করতে থাকে, অপরদিকে একজন সালেহ বা পুণ্যবান এর বাইরে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উপরে প্রদর্শনকামীর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মুত্তাকি সারাদিন লড়াই করে।

প্রদর্শনমুখিতা ও ধৈর্যের মধ্যে সংঘর্ষ।

অনেক সময় প্রদর্শনমুখিতা এবং ধৈর্যের সঙ্গে সংঘাত বাধে। আল্লাহ্‌র গ্রন্থের বিপরীতে, মানুষ কখনও ক্রোধও প্রদর্শন করে। গালি শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাকওয়া তাকে শিক্ষা দেয় ক্রোধে উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে। যেরূপ কুরআন মজীদের বলা হয়েছে- وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (ফুরকান, আয়াত: ৭৩) অনুরূপভাবে অধৈর্যের সঙ্গেও তাকে প্রায়শই লড়াই করতে হয়। অধৈর্য বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে তাকওয়ার পথে তাকে এমন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয় যে, গন্তব্যে পৌঁছানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সে অধৈর্য হয়ে পড়ে। যেমন পঞ্চাশ হাত গভীর একটি কুয়ো খনন করতে গিয়ে যদি দুই-চার হাত খনন করে কাজ ফেলে বসে পড়ি, তবে এটি হতাশা ছাড়া কিছুই নয়। তাকওয়ার শর্ত হল, চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছানো পর্যন্ত আল্লাহ্ তা’লার বিধিনিষেধ পালন করে যাওয়া এবং অধৈর্য না হওয়া।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪-১৬) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্য হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

(পূর্বের সংখ্যার পর)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আরও একটি অভিযোগ যা ইসলাম সম্পর্কে করা হয় সেটি হল মহিলাদের প্রতি আচরণ প্রসঙ্গে। কিছু অমুসলিমদের আশঙ্কা, মুসলিমরা যদি পশ্চিমি দেশসমূহের দিকে হিজরত করে তবে তারা স্থানীয় মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং তাদের সঙ্গে অসভ্যতা করবে। অবশ্যই কিছু শরণার্থী এই অপরাধ করেছেও। এই ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের এমন নির্লজ্জ আচরণের কারণে। এখানে আমি নির্দ্বিধায় একথা বলতে চাই যে, যদি কেউ কোন মহিলার মর্যাদাহানি করে বা কোনও প্রকারে তার সঙ্গে অসভ্যতা করে, তবে সে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে। ইসলাম এমন কাজ পাপ নামে অভিহিত করেছে। ইসলাম এমন গর্হিত অপকর্মের কঠিন শাস্তির বিধান করেছে। যেমন, ইসলামের শিক্ষা হল, যদি কেউ এমন অপরাধ করে তবে তাকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে চাবুকাঘাত করতে হবে। অতএব আপনারা যদি এমন আচরণকে সমূলে উৎপাটন করতে চান, তবে এমন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত মুসলমানকে ইসলামি আইন অনুসারে শাস্তি দিন। যদিও আমার বিশ্বাস, পশ্চিমি দেশগুলি এবিষয়ে একমত হবে না। তার উপর মানবাধিকার কর্মীরা তো অবশ্যই এর বিরোধীতা করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আরও একটি বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সরকারের উপর অনেক বড় আর্থিক বোঝা চাপবে। এই কারণে শরণার্থীদেরকে কোন দেশে অধিকার আদায়ের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়, বরং এই মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করা উচিত যে, তারা এই দেশকে কি দিতে পারে। আমি পূর্বে কয়েকবার বলেছি যে, শরণার্থীরা সেই দেশের কাছে ঋণী যে দেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশ ও দেশের জনসাধারণের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে স্বাগতিক দেশের কাছে কেবল ভাতা ও সুযোগ সুবিধা আদায় করার পরিবর্তে যথাশীঘ্র নিজেদেরকে সমাজের কল্যাণকর অংশ হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করা উচিত। যত সাধারাণ কাজই হোক না কেন, তাদের কাজ করা উচিত। এর ফলে তাদের যে শুধু সম্মান ও মর্যাদা বজায় থাকবে তা নয়, বরং এর ফলে সংশ্লিষ্ট সরকারের বোঝাও কমবে আর স্থানীয় মানুষদের অস্থিরতাও প্রশমিত হবে। প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের নবী (সা.) বলেছেন, দাতা গ্রহীতার চাইতে উত্তম। অনেক সময় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদেরকে লোকেরা সাহায্য করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে এবং নিজে উপার্জন করে জীবন ধারণ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। সরকার শরণার্থীদের যাবতীয় চাহিদাবলী পুরণ না করে, যদি সামান্য কাজেরও ব্যবস্থা করে দেয়, সেটি তাদের যোগ্যতার থেকে নিম্নমানের হলেও তা করা উচিত। তার বোঝা হয়েই যদি থেকে যায়, তবে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারবে না। অধিকন্তু অস্থিরতা ও অরাজকতার কারণ হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এছাড়াও সরকার যদি শরণার্থীদেরকে কিছু আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে, তবে এবিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এর ফলে স্থানীয় মানুষদের জীবনধারণের চাহিদাবলী উপেক্ষিত হবে না। কয়েকটি দেশে শরণার্থীরা করদাতাদের থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। স্বভাতই এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। এই কারণে প্রত্যেকটি দেশকে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের সময় বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে হবে, যেখানে শরণার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে। বরং স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি শরণার্থীদের তুলনায় বেশি ভাল আচরণ বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি একটি সংবাদ প্রকাশ্যে আসে যে, জার্মান সরকার একটি নতুন নীতি প্রনয়ণ করছে, যাতে বলা হয়েছে, শরণার্থীদেরকে জার্মানীতে থিতু হওয়ার পূর্বে একবছর কমিউনিটি সার্ভিস করা আবশ্যক। কিছু সমালোচক এখন থেকেই দাবি করছে, এটি সস্তা শ্রম আদায় করার ফন্দি মাত্র, অন্যথায় এটি সমাজে সমন্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনওভাবেই সহায়ক নয়। কিন্তু আমার মতে যে কেউ সমাজে কোন কাজে নিয়োজিত, সে সেই কাজে ফলে সমাজে সমন্বিত হচ্ছে। 'কমিউনিটি সার্ভিস' একটি ইতিবাচক শব্দ। কেননা এর ফলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যে, সমাজের সেবা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই কারণে জার্মান সরকারের এই নীতি সমালোচনার পরিবর্তে প্রশংসার যোগ্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সকলের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করা কেবল স্বাগতিক সরকারেরই দায়িত্ব নয়। বরং শরণার্থীদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা যথাশীঘ্র সমাজের কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হতে পারে। শরণার্থীদের কাজে কাজের জন্য যদি উপযুক্ত যোগ্য না থাকে, তবে তাদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া ও শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজের সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে তারা দ্রুত কর্মদক্ষ হয়ে ওঠে। তাদের প্রশিক্ষনের জন্য যে খরচ হবে তা সেই দেশ ও জাতির এক মূল্যবান ভবিষ্যদ সম্পদ হিসেবে রক্ষিত থাকবে। যতদূর নিরাপত্তার বিষয়টির প্রসঙ্গ, যে যে শরণার্থী সম্পর্কে বা তাদের অতীত সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেয়, প্রশাসনকে তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং ক্রমাগত তাদের উপর তত্ত্বাবধান করা উচিত, যতদিন পর্যন্ত না আশ্বস্ত হওয়া যায় যে এখন এরা সমাজের জন্য আর বিপদের কারণ নয়। অনেকে এটিকে অপরের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপকারী নীতি হিসেবে মনে করবে, কিন্তু সমাজকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখা এবং জাতির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যে কোন দেশের সব থেকে বড় দায়িত্ব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি কোন শরণার্থী নাশকতা বা অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে অবশ্যই সে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে। কুরআন মজীদে সূরা বাকারার ১৯২ নং আয়াতের বলা হয়েছে, যদিও হত্যা এক জঘন্য অপরাধ, কিন্তু অশান্তি ও বিদ্বেষ ছড়ানো এর থেকেও জঘন্য অরাধ। এর অর্থ এই নয় যে, কাউকে হত্যা করা সামান্য অপরাধ। বরং এর দ্বারা এবিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, সমাজে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অশান্তি ছড়ানো বেশি ভয়াবহ এবং পরিশেষে এর প্ররোচনা সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এটি এমন মতভেদ ও যুদ্ধের কারণে পর্যবসিত হয় যা অজস্র নিরীহ মানুষকে গ্রাস করে এবং তারা অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়। ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এও বলেছেন যে, প্রকৃত মুসলমান সেই, যার কথা ও হাত থেকে অন্যান্য মানুষ নিরাপদ থাকে। তাই একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা উগ্রবাদকে উৎসাহ দেয়? একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম সমাজে অশান্তি ছড়ায়? কেউ এমন দাবি কিভাবে করতে পারে যে, ইসলাম মহিলাদের মর্যাদাহানি করে? একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম তার অনুসারীদের অপরের ধন-সম্পদের উপর দখল জমানোর অনুমতি দেয়? যে কেউ এমন অপরাধ করবে, সে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সেটিকে বৈধ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুক বা না করুক, সেই ইসলামের শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে আর নিজের এই অন্যায়ের জন্য সে নিজেই দায়ী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশ্বস্ততার উচ্চ মান বজায় রাখার প্রত্যাশা করে। যেমন, কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উপদেশ করে বলেন, তারা যেন সম্পদ অর্জন করার সময় কখনওই ছল বা প্রতারণার আশ্রয় না নেয়। বরং তাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় এমন বিশ্বস্ততা অবলম্বন করবে, যে কেউ তোমাদের উপর ভরসা করতে পারে। এবং সত্যতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত কর। অনুরূপভাবে সূরা মুতাফফিফিনের ২ ও ৪ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ব্যবসা ও বানিয্যে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত মানুষ যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি ওজন নেয়, কিন্তু দেওয়ার সময় ওজনে কম দেয়, যারা ব্যবসায় নিজের লাভের জন্য অপরের শোষন করে, তাদের জন্য ধিক্কার। অবশেষে তারা অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বস্তুতঃ ইসলাম সমাজকে যাবতীয় প্রকারের অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার থেকে নিরাপদ বানিয়েছে। ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করে। তাই অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল, তা সত্ত্বেও মানুষ হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। অথচ আঁ হযরত (সা.) সমাজে এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছেন। মানব ইতিহাসে আমরা এমন উচ্চ মানের নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত অন্যত্র দেখতে পাই না, যেরূপ প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানেরা স্থাপন করে গেছেন। তারা অপরের থেকে সুযোগ সুবিধা নিতেন না, বরং অপরের অধিকার যাতে প্রভাবিত না হয় সেটিই সুনিশ্চিত করতে তৎপর হতেন। যেমন, একবার আঁ হযরত (সা.)–এর সাহাবী নিজের এক ঘোড়া দুশ দিনারের বিনিময় মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যান। অপর এক সাহাবী সেই ঘোড়া ক্রয় করতে এলে তিনি সাহাবীকে বলেন, এই ঘোড়ার দাম দুশ দিনার খুবই কম। এর প্রকৃত মূল্য পাঁচশ দিনার হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বলেন, কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বরং নিয়মানুসারেই দরদাম করতে চান আর পাঁচশ দিনারই দেবেন। ঘোড়া বিক্রেতা সাহাবী বলেন, আমিও কোন দয়া-দাক্ষিন্য গ্রহণ করতে চাই না, তাই আমিও এর যথাযথ মূল্য দুশ দিনারই গ্রহণ করব। তাঁদের মধ্যে নিজের লাভের পরিবর্তে অপরকে অধিকার ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল।

(ক্রমশ:.....)

জুমআর খুতবা

“ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক ওয়াক্তের নামায কাবা ব্যাতিরেকে অপর যে কোন মসজিদের হাজার হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।”

“সাহাবাদের জীবনী বর্ণনার পাশাপাশি অনেক সমস্যার সমাধানও বেরিয়ে আসে।”

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তমান প্রতীক মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবাগণ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ফেব্রুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৮ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত আবু মুলায়েল বিন আলআযআর। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে আমর বিনতে আশরাফ। আর তার সম্পর্ক ছিল আনসারের অউস গোত্রের সাথে। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তার সৌভাগ্য হয়েছে। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৩, আবু মুলায়েল বিন আলআযআর (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৫, আবু মুলায়েল বিন আলআযআর (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

এক রেওয়ায়েত অনুসারে তার ভাই হযরত আবু আবিদ বিন আযহারও বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৫, আবু হাবীব বিন আলআযআর (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে হযরত আনাস বিন মুআয আনসারীর। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম উনায়েসও উল্লেখ করা হয়েছে। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে উনাস বিনতে খালিদ। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে তার ভাই হযরত উবাই বিন মুআযও তার সাথে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।এক রেওয়ায়েত অনুসারে তার মৃত্যু হয়েছে হযরত উসমানের খিলাফতকালে। অথচ অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আনাস বিন মুআয এবং তার ভাই উবাই বিন মুআয বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮১, আনাস বিন মুআয (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক ১৯৯০ সালে) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, আনাস বিন মুআয বিন আনাস (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রা.) এর। তার ডাকনাম ছিল আবু শায়খ। হযরত উবাই বিন সাবেতের সম্পর্ক ছিল খাযরাজের শাখা বনু আদী গোত্রের সাথে। তার ডাকনাম ছিল আবু শায়খ। ভিন্ন উক্তি অনুসারে এই ডাকনাম তার পুত্রের ছিল। তার মায়ের নাম ছিল সুখতা বিনতে হারেসা। হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং হযরত অউস বিন সাবেতের ভাই ছিলেন হযরত উবাই বিন সাবেত। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয়েছে বি'রে মঊনার ঘটনার সময়।

হযরত উবাই বিন সাবেত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কি করেন নি-এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উবাই বিন সাবেত অজ্ঞতার যুগেই ইন্তেকাল করেছেন আর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যিনি অংশগ্রহণ করেছেন তিনি ছিলেন তার পুত্র আবু শায়খ বিন উবাই বিন সাবেত। আল্লামা ইবনে হিশাম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত আবু শায়খ উবাই বিন সাবেতকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত উবাই বিন সাবেত এর মৃত্যু সম্পর্কে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছেন। অবশ্য অন্য রেওয়ায়েতে এটিই দেখা যায় যে, তার মৃত্যু হয়েছে ওহুদের যুদ্ধের সময়। যাহোক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ওহুদের যুদ্ধে যে সাহাবী শহীদ হয়েছেন, সেই সাহাবী তিনি ছিলেন না বরং তার ভাই হযরত অউস বিন সাবেত ছিলেন।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮২, আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫-১৬৬, আবু শায়খ উবাই বিন সাবেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯, আবি বিন সাবিত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (সীরাত ইবনে হিসাম, পৃঃ ৩৪০, মিন হাযর বদরান, দার ইবনে হযম বেরুত থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার এর। তার ডাক নাম ছিল আবু বুরদা। তিনি তার ডাক নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তার নাম ছিল হানি। এক রেওয়ায়েতে তার নাম হারেস আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তার নাম মালেকও উল্লেখ হয়েছে। তার সম্পর্ক ছিল বনু কুযাআ গোত্রের বালী বংশের সাথে। হযরত আবু বুরদা হযরত বারাআ বিন আযেবের মামা ছিলেন। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বুরদা হযরত বারাআ বিন আযেবের চাচা ছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন বনু হরেসার পতাকা হযরত আবু বুরদার কাছেই ছিল। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪৪, আবু বুরদা বিন নিয়ার (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (আসাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১-৩২, আবু বুরদা বিন নিয়ার (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮, হানি বিন নিয়ার (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত আবু আব্স এবং হযরত আবু বুরদা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তারা উভয়ে বনু হারেসা গোত্রের প্রতিমাগুলোকে ভেঙে ফেলেন। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪৩, আবু আব্স বিন জুবের (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) অর্থাৎ গোত্রের নির্দিষ্ট প্রতিমাগুলো ভেঙে ফেলেন। হযরত আবু উমামার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের জন্য বদর অভিমুখে যাত্রার সংকল্প করেন তখন হযরত আবু উমামাও তাঁর সাথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন তার মামা হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবার জন্য থেকে যাও। মা অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি বলেন যে, তুমি যেও না। হযরত আবু উমামার হৃদয়েও আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথম আগ্রাসন, আমিও যাব, তাই তিনি বলেন, তিনি আপনারও বোন, আমাকে যখন বলছেন, আপনি থেকে যান। এ বিষয়টি যখন মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থাপিত হয় তখন তিনি (সা.) হযরত আবু উমামাকে অর্থাৎ ছেলেকে পেছনে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর আবু বুরদা ইসলামী বাহিনীর সাথে যান। মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন ততক্ষণে হযরত আবু উমামার মা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়ান। (আসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫, আবু উমামা বিন সালেবা (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কাছে দুটি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়া ছিল মহানবী (সা.) এর কাছে যার নাম ছিল আস-সাকফ। আর দ্বিতীয় ঘোড়াটি ছিল হযরত আবু বুরদার কাছে যার নাম ছিল মুলাবেহ্। (আত্তবকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮০, যিকর খায়লুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদোয়াবা, **কর্তৃক বেরুত** থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কিছু গোত্রের কাছে যান। তাদের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু একটি গোত্রকে তিনি বাদ দেন। তাদের কাছে যান নি। এ কারণে এ বিষয়টি তাদের খুব অপছন্দ হয়। তারা এর কারণ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়। আর নিজেদের এক সাথির মালপত্রের তল্লাশি নেয়। তখন তার চাদর থেকে একটি হার বের হয় যা সে অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিল। তখন তারা সেই হার ফেরত দেয়। তখন মহানবী (সা.) তাদের কাছেও যান এবং তাদের জন্যও দোয়া করেন। (আল-মাজমাউল কবীর লিলতিবরানী, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৯৫, মাআসানদাহ্, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রাঃ), হাদিস ৫১১, দার আ**হ ইয়ায়ুত্তেরাসুল আরবী কর্তৃক বেরুত** থেকে২০০২ সালে প্রকাশিত)

হযরত আবু বুরদা হযরত আলীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যু হয়েছে হযরত মাবিয়ার শাসনকালের প্রথমদিকে। তার মৃত্যুর সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার মৃত্যু হয়েছে ৪১ হিজরীতে। আর অন্য রেওয়ায়েতে ৪২ বা ৪৫ হিজরীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (আসাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২, আবু বুরদাহ্ বিন নিয়ার (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

হযরত বারাআ বিন আযেবের পক্ষ থকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের সম্বোধন করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের মতো নামায পড়ে আর আমাদের কুরবানী করার ন্যায় কুরবানী করে, সে সঠিক কুরবানী করেছে। আর যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে, সেই প্রাণী নিছক মাংসের উদ্দেশ্যেই জবাই হলো। অর্থাৎ ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা কুরবানী নয় বরং সেটি মাংস খাওয়ার জন্য ছাগল জবাই করার নামান্তর। তখন হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার অর্থাৎ যেই সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করেছি। আমার ধারণা ছিল আজকের দিনটি হলো পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি কুরবানী করে ফেলি, নিজেও খেয়েছি আর পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশিদেরও খাইয়েছি। মহানবী (সা.)বলেন, এই ছাগল তো মাংসসর্বস্ব হলো, এটি কোন কুরবানী নয়। তখন হযরত আবু বুরদা বলেন, আমার কাছে এক বছর বয়স্ক পাঠা আছে যা মাংসের দিক থেকেদুই ছাগলের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ বেশ বড়সড়, যদিও এক বছর বয়স্ক কিন্তু দুটো ছাগলের চেয়ে উত্তম ও মোটাতাজা। আমি যদি তা কুরবানী করি তাহলে কি তা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কুরবানী কর, কিন্তু তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব কালামুল ইমাম ও আননাস ফিল খুতবাতুল ঈদ , হাদিস ৯৩৮) অর্থাৎ তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তোমার পর আর কারো অনুমতি থাকবে না।

অন্যান্য হাদীস থেকেও এটিই প্রতিভাত হয় যে, প্রধানত ঈদের পরেই কুরবানী করা বিধেয়। আর দ্বিতীয়ত কুরবানীর প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট বয়স হয়ে থাকে, তা হওয়া উচিত। যাহোক তিনি (সা.) যে বলেছেন, তোমার পর আর কারো পক্ষে তা যথেষ্ট হবে না- এ সম্পর্কে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বৈঠকেও প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কুরবানীর ছাগলের বয়স কত হওয়া উচিত? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সেখানে বসা ছিলেন, তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আপনি উত্তর দিন। তখন তিনি (রা.) বলেন, আহলে হাদীসের মতে কুরবানীর প্রাণী দু'বছর বয়স্ক হওয়া আবশ্যক। (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০০)

অথবা আমাদের দেশীয় রীতি অনুযায়ী বলা হয় যে, সামনের বড় দুই দাঁত বের হওয়া আবশ্যক। যাহোক তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বুরদাকে বলেন যে, আমি তোমার এই এক বছর বয়স্ক ছাগলের কুরবানী গ্রহণ করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কারো জন্য এটি হবে না, বরং প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল বা পাঠা হওয়া আবশ্যক। আমাদের জামা'তেও এই রীতিই প্রচলিত আছে বা আমাদের ফিকাহ্-তে রয়েছে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই বলেছেন যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আসাদ বিন ইয়াযিদের। হযরত আসাদের পিতার নাম ছিল ইয়াযিদ বিন আলফাকে। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরায়ে ক শাখার সাথেতার সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক আসাদ এর পরিবর্তে সাদ বিন ইয়াযিদ নাম আসহাবে বদর এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত আসাদ বিন ইয়াযিদ এর নাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম সাদ বিন যায়েদ সাঈদ বিন আল-ফাকে এবং সাদ বিন ইয়াযিদ বর্ণনা করেছে। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪৫, আসাদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (আসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, সাদ বিন আলফা (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন বদরী সাহাবী ছিলেন হযরত তামিম বিন ইয়ার আনসারী। হযরত তামিম এর পিতার নাম ছিল ইয়ার। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু জিদারা বিন অউফ বিন আলহারেসের সাথে। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত তামিম এর সন্তান-সন্ততির মাঝে ছেলে রেবি আর কন্যা জামিলা ছিলেন। তার মাতা বনু আমর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৭, তামিম বিন ইয়ার (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো অউস বিন সাবেত বিন মুনযের। তিনিও আনসারী ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু শিদ্দাদ। হযরত অউসের পিতার নাম ছিল সাবেত। তার মায়ের নাম ছিল হযরত সুখতা বিনতে হারেসা। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত শিদ্দাদ বিন অউসের পিতা ছিলেন। আনসারদেরবনু আমর বিন মালেক বিন নাজ্জার গোত্রের সাথেতার সম্পর্ক ছিল। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ঈমান এনেছেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি হযরত হাসসান বিন সাবেত এবং উবাই বিন সাবেত তার ভাই ছিলেন। হযরত উসমান বিন আফফান যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি তার ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফান এবং হযরত অউস বিন অউস এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন আম্মারাহ্আনসারী বলেন যে, ওহুদের যুদ্ধে তার শাহাদতের ঘটনা ঘটে। কেউ কেউ তার এই মতের সাথে একমত নন, কিন্তু মতভেদকারীরা দুর্বল রাবী।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮২, ৪১ উসমান বিন আফফান (রাঃ), অউস বিন সাবেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো আরেক সাহাবীর। তার নাম হলো হযরত সাবেত বিন খানসা। তিনি বনু গানাম বিন আদী বিন নাজ্জারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছেতার। তার সম্পর্কে মাত্র এতটাই জানা যায়।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৯, সাবেত বিন খানসা (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত অউস বিন সামেত, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত অউস বিন সামেত হযরত উবাদা বিন সামেতের সহোদর ছিলেন। হযরত অউস বিন সামেত বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত অউস বিন সামেত এবং হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ আলগানাবী-র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত অউস তার স্ত্রী খুয়ায়লা বিনতে মালেক এর প্রতি যিহার করেছিলেন। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১৩, অউস বিন সামেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, অউস বিন সামেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

যিহার হলো আরবদের রীতি অনুসারে স্ত্রীকে মা বলে দেয়া বা বোন বলে

ইমামের বাণী

আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, পৃষ্ঠা: ৯১)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত
আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

বসা। আর এটি বলার পর তাদেরকে নিজের জন্য হারাম জ্ঞান করত, অর্থাৎ তুমি আমার মা, তাই আমার জন্য অবৈধ। ইসলাম এই রীতিকে বিলুপ্ত করেছে আর বলেছে এই শব্দ বললেই তালাক হয়ে যায় না। মা-বোন বললেই তালাক হয়ে যায় না। তবে এটি অপছন্দনীয় বিষয়,যার শাস্তিস্বরূপ ইসলাম প্রায়শ্চিত্ত বা কাফফারা নির্ধারণ করেছে। হযরত অউস প্রায়শ্চিত্ত না করে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এতে মহানবী (সা.) বলেন যে, এটি অবৈধ, পনেরো'সা' ভুট্টা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। অর্থাৎ এর প্রায়শ্চিত্ত হলো ষাটজনকে মিসকীনকে তুমি খাবার খাওয়াও। যিহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(সূরা মুজাদেলা : ৩-৫)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের মা বলে বসে, তারা তাদের মা হতে পারে না। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং মিথ্যা একটি কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং মার্জনাকারী। আর যারা নিজেদের স্ত্রীকে মা বলে বসে, আর এরপর যা বলে তা থেকে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রথমে মা বলে বসে এরপর বলে যে, ভুল হয়ে গেছে। তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে এক কৃতদাসকে মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সে যুগের রীতি অনুসারে এক কৃতদাসকে মুক্ত কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি সে বিষয় যা সম্পর্কে তোমাদের নসীহত করা হচ্ছে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবসময় সবিশেষ অবহিত। আর যার এমনটি করার সামর্থ্য নেই, অর্থাৎ কৃতদাস মুক্ত করার যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে লাগাতার দু মাস রোযা রাখতে হবে। আর যে এরও সামর্থ্য রাখে না তার ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। এটি এজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পার। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা আর কাফেরদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন যে, যে নিজ স্ত্রীকে মা বলে বসে সে বাস্তবে তার মা হতে পারে না, কেননা মা তারাই যাদের ঔরষে তারা জন্ম নিয়েছে। অতএব তাদের এই কথা অযৌক্তিক এবং সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং মার্জনাকারী। আর যারা মা বলার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন কৃতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এটিই সর্বজ্ঞাত খোদার পক্ষ থেকে নসীহত। যদি কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে দুমাস রোযা রাখতে হবে। আর যদি রোযা রাখতে না পারে তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। (আরিয়া ধরম, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫০)

হযরত খুয়ায়লা বিনতে মালেক বিন সালেবার পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমার স্বামী অউস বিন সামেত আমার প্রতি যিহার করেন। আমি অভিযোগ নিয়ে মহানবী (সা.) এর দ্বারস্থ হই। মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে আমাকে বলছিলেন যে, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, সে তোমার চাচাতো ভাইও বটে। কিন্তু আমি আমার কথায় অনড় ছিলাম যতক্ষণ না কুরআনের আয়াত নাযেল হয়। মহানবী (সা.) বলেন যে, মা কিভাবে হতে পার, সে তোমার চাচাতো ভাইও, আর তুমি তার স্ত্রী। তিনি বলেন, যাহোক আমি এই কথার ওপর অনড় ছিলাম যতক্ষণ না পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযেল হয় যে, قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا (সূরা মুজাদেলা: ২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে নিজের স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে বিতণ্ডা করছিল।

তিনি (সা.) বলেন, সে অর্থাৎ তোমার স্বামী একজন কৃতদাস মুক্ত করবে। কুরআনের আয়াত অনুসারে তার শাস্তি তা-ই হবে যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃতদাস মু ক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম যে, তার সেই সামর্থ্য নেই, কোত্থেকে দেবে, সে দরিদ্র। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে লাগাতার দুমাস রোযা রাখতে হবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) তার বয়স এমন যে সে রোযাও রাখতে পারবে না, তার দেহে সেই শক্তি নেই। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। আমি বললাম, তার কাছে সেই সম্পদও নেই যা থেকে সে সদকা করতে পারে। খুয়ায়লা বলেন, আমি বসেই ছিলাম, তখনই এক বস্তা খেজুর আসে, মহানবী (সা.) এর কাছে কেউ তা নিয়ে আসে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি তাকে আরেক বস্তা খেজুর দিয়ে সাহায্য করব। অর্থাৎ এই বস্তাটি যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আরেক বস্তার ব্যবস্থা হতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এটি নিয়ে যাও, আর তার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। আর এরপর তোমার চাচার পুত্র বা তোমার স্বামীর কাছে যাও। (সুনান আবি দাউদ কিতাবুত্তালাক বাব ফিল যিহার হাদিস ২২১৪) তার বলাতেই তুমি তার মা হয়ে যাও নি। সাহাবীদের জীবনীর বর্ণনায় কতিপয় মাসলা -মাসায়েলেরও সমাধান হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটিই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম যিহার। অর্থাৎ স্ত্রীকে মা বলার ঘটনা হযরত অউস বিন সামেতেরই ছিল। তার চাচাতো বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনি তার প্রতি যিহার করেছিলেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, অউস বিন সামেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

যাহোক আল্লাহ্ তা'লা এই সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। এই বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগেও উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন, এটিই এর শাস্তি। হযরত খলীফা সানীর যুগেও এ ধরনের একটি বিষয় তার সামনে উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন যে, এটিই শাস্তি। তবে হ্যাঁ কেউ যদি অত্যন্ত দরিদ্র হয় আর কোন সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো ইস্তেগফার করা, আর যতটা সাধ্য বা সামর্থ্য আছে সে যেন তা দেয়, এটিই তার শাস্তি। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা স্ত্রীকে মা বা বোন বলার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কারো কারো অভ্যাস হয়ে থাকে সামান্য বিষয়ে ঝগড়া হলে বলে বসে যে, তুমি আমার জন্য হারাম। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো। তুমি এই, তুমি সেই, বা কসম খেয়ে বসে। অতএব এই সমস্ত কসমের জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বা শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন অর্থাৎ কৃতদাস মু ক্ত কর বা রোযা রাখ বা মিসকীনদের খাবার খাওয়াও।

হযরত অউস বিন সামেত কবিও ছিলেন। হযরত অউস বিন সামেত এবং শিদ্দাদ বিন অউস বায়তুল মাকদাস এ বসবাস করতেন। তার মৃত্যু হয়েছে ৩৪ হিজরীতে ফিলিস্তিনের রামলাতে। তখন হযরত অউসের বয়স ছিল ৭২ বছর। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩, অউস বিন সামেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আরকাম বিন আবি আরকাম। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত আরকামের মায়ের নাম ছিল উমায়মা বিনতে হারেস। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম হলো তুমাযের বিনতে হুয়ায়েম আর সাফিয়া বিনতে হারেসও বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আরকামের সম্পর্ক ছিল বনু মাখযুম গোত্রের সাথে। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তার পূর্বে মাত্র এগারো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, ইসলাম গ্রহণে তার নম্বর ছিল সপ্তম। হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আরকাম হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ এবং হযরত উসমান বিন মাযঊন একসাথে একই সময়ে ঈমান এনেছেন। হযরত আরকামের ঘর মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাশে অবস্থিতছিল, যা ইতিহাসে দ্বারে আরকাম নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারে আরকাম তার ঘর ছিল। এ ঘরে মহানবী (সা.) এবং ইসলাম গ্রহণকারীরা ইবাদত করতেন। হযরত ওমর এখানেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার অর্থাৎ হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ এ উপনীত হয় আর তারা সেই ঘর থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। এই ঘর হযরত আরকামের মালিকানায় ছিল। এরপর তার পৌত্ররা এই ঘর আবু জাফর মনসুর এর কাছে বিক্রি করে দেয়। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, অউস বিন সামেত (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত) (মুসতদরক আলাল সহীন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪, হাদিস ৬১২৭, কিতাব মারিফাতুল সাহাবা যিকর আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)

এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলোইসলামের প্রথম তবলীগি কেন্দ্র অর্থাৎ দ্বারে

আরকাম সম্পর্কে তিনি লিখেন যে, মহানবী (সা.) ভাবলেন যে, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত, যেখানে মুসলমানরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নামায ইত্যাদির জন্য সমবেত হতে পারে আর শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে নীরবে রীতিমত ইসলামের তবলীগ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে এমন একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। অতএব তিনি (সা.) একজন নবমুসলিম আরকাম বিন আবি আরকাম এর ঘর পছন্দ করেন যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এরপর সব মুসলমান সেখানেই সমবেত হতো, সেখানেই নামায পড়তো, সেখানেই সত্যসন্ধানীরা আসতো, অর্থাৎ যারা ইসলামের সন্ধানে ছিল তারা ইসলামের বাণী শুনতো এবং শুনার জন্য আসতো, মহানবী (সা.) এর সাহচর্যে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আসতো আর মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণে এ ঘরটি ইসলামে বিশেষ সুখ্যাতি রাখে আর দারুল-ইসলাম নামে এটি সুপরিচিত।

মহানবী (সা.) প্রায় তিন বছর পর্যন্ত দ্বারে আরকামে কাজ করেন। অর্থাৎ তাঁর অভ্যুদয়ের চতুর্থ বছর এটিকে তিনি কেন্দ্র হিসেবে অবলম্বন করেন আর ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত তিনি এতে নিজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছে যে, "দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওমর, যার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের প্রভূত শক্তি লাভ হয় আর তারা দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে তবলীগ আরম্ভ করে। (সীরাত খাতামান্নাবিঈন- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এম.এ., পৃঃ ১২৯)

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত আরকামের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন হযরত আবু তালহা যায়েদ বিন সাহাল-এর সাথে। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮৫, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

হযরত আরকাম বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে বদরের গনিমতের মাল থেকে একটি তরবারি দিয়েছিলেন। হযরত আরকাম বদর এবং ওহুদ সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় একটি ঘরও দিয়েছিলেন। একবার মহানবী (সা.) তাকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত আরকাম **'হিলফুল ফুযুল'**-এর চুক্তিতে অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। (ইসতিয়াব ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১ আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ) , দারুল জেল কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)

অর্থাৎ সেই চুক্তি যা ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে দরিদ্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গঠন করেছিল, মহানবী (সা.)ও যার সদস্য ছিলেন। হযরত আরকামের পুত্র ওসমান বিন আরকাম বর্ণনা করেন যে, আমার পিতার মৃত্যু ৫৩ হিজরীতে হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৮৩ বছর। কেউ কেউ বলে ৫৫ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়েছে। তার বয়স ৮০ ছিল না এর কিছু বেশি ছিল সে সম্পর্কে মতভিন্নতা রয়েছে। হযরত আরকাম ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তার জানাযা পড়াবেন হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। মারওয়ান বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে যে, মহানবী (সা.) এর সাহাবীকে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতির কারণে দাফন করা হবে না, আর তিনি উপস্থিত নেই তাই যতক্ষণ তিনি না আসবেন ততক্ষণ লাশ রেখে দেওয়া হবে! তিনি তার জানাযার নামায নিজেই পড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ বিন আরকাম মারওয়ান এর কথা গ্রহণ করেন নি। হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাসের আসার পর হযরত আরকামএর জানাযার নামায আদায় করা হয় আর জান্নাতুল বাকী-তে কবরস্থ করা হয়। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

তার সম্পর্কে আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, একবার হযরত আরকাম বায়তুল মাকদাস যাওয়ার জন্য সফরের প্রস্তুতি নেনআর মহানবী (সা.)এর কাছে সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি বায়তুল মাকদাস-এ কোন প্রয়োজনে নাকি ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছ? হযরত আরকাম উত্তর দেন যে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোন কাজ নেই, ব্যবসার জন্যও যাওয়া হচ্ছে না,বরং বায়তুল মাকদাস এ নামায পড়তে চাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার এই মসজিদে অর্থাৎ মদীনার মসজিদে এক বেলার নামায অন্য মসজিদে হাজার হাজার বেলার নামাযের চেয়ে উত্তম, একমাত্র কাবা শরীফ ব্যতীত। তখন তিনি ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আরকাম বিন আবি আল আরকাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন, হযরত বাসবাস বিন আমর। এক রেওয়ায়েতে তার নাম হযরত বাসবাস বিন বিশরও রয়েছে। হযরত বাসবাস জোহনী আনসারীর সম্পর্ক বনি সায়েদা বিন কাব বিন খাযরাজ এর সাথে ছিল। কিন্তু উরওয়া বিন যুবায়ের এর মতে তার সম্পর্ক হলো বনু যরিফ বিন খাযরাজ এর সাথে। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর তিনি আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩, বাসবাস বিন জোহনী (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) তিনি বুসায়সা, বুসায়েস আর বাসবাসাহ্ হিসেবেও পরিচিত। বদর ছাড়া ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪২২, বাসবাস বিন আমর (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় মহানবী (সা.) তাঁর অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাখতুমকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন খুব সম্ভব এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ বাহিনীর আগমন-সংবাদের দাবি হলো মদীনার প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেন দৃঢ় থাকে, তাইএই লক্ষ্যে তিনি আবু লুবাবা বিন মুনযেরকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান। আর আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাখতুম সম্পর্কে নির্দেশ জারী করেন যে, তিনি শুধু ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন, কিন্তু প্রশাসনিক কার্যক্রম সমাধা করবেন আবু লুবাবা। মদীনার পাহাড়ি বসতির জন্য অর্থাৎ কুবা-র জন্য তিনি আহসান বিন আদীকে পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন। এই জায়গা অর্থাৎ যেখানে আমীর নিযুক্ত করেন বা এমারতে পরিবর্তন আনেন, সেখান থেকেই তিনি বাসীস অর্থাৎ বাসবাস এবং আদী বিন আদী নামের দুই ব্যক্তিকে শত্রুর গতিবিধির খবর সংগ্রহের জন্য বদর পানে প্রেরণ করেনআর খবরাখবর নিয়ে সত্বর ফিরে আসার নির্দেশ দেন। (সীরাত খাতামান্নাবিঈন- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এম.এ., পৃঃ ৩৫৪)

দু সপ্তাহ পূর্বে খুতবায় হযরত আদি বিন আবি যাগবা-র স্মৃতিচারণে এই ঘটনারও উল্লেখ ছিল যে, যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা ছিলেন হযরত বাসবাস এবং হযরত আদী বিন আবি যাগবা। যখন তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য বদর এর প্রান্তরে পৌঁছেন তখন হযরত বাসবাস এবং আদী বিন আবি যাগবা পার্শ্ববর্তী একটি টিলায় নিজেদের উটকে বসিয়ে নিজেদের মশক নিয়ে কূপ থেকে পানি ভরেন এবং তা পান করেন। সে সময় তারা সেখানে দুজন মহিলাকে কথা বলতে শুনেন, যারা কোন কাফেলার আগমন সম্পর্কে আলোচনা করছিল।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬১৭, বাসবাস ও আদি ইয়াতজিসানুল আখবার, তারাসুল ইসলাম মিশর থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

সেখানে অপর এক ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে ছিল। যাহোক তাদের উভয়ে ফিরে আসেন। আর মহানবী (সা.)-কে এই দুজন মহিলার পারস্পরিক আলাপচারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তারা এভাবে এক কাফেলার আগমন সম্পর্কে কথা বলছিল। যে ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার নাম ছিল মাজ্‌দী, এ কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। ঐতিহাসিক লিখেন যে, পরবর্তী প্রভাতে আবু সুফিয়ান সেখানে পৌঁছে। ততক্ষণে কাফেলাও সেখানে পৌঁছে যায়। সে মাজদীকে জিজ্ঞেস করে যে, হে মাজদী! তুমি কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখেছ যে এখানে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এসে থাকবে। একইসাথে সে এটিও বলে যে, তুমি যদি আমাদের কাছে কোন কথা গোপন কর তাহলে কোন কুরাইশ কখনো তোমার সাথে কোন সন্ধি করবে না। মাজদী অর্থাৎ যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে বললো, খোদার কসম,আমি এখানে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখি নি যাকে আমি চিনি না। এখানে তোমার এবং মদীনার মাঝে কোন শত্রু নেই, আর কেউ থাকলে সে আমার দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। আর আমিও তোমার কাছে গোপন করতাম না। অবশ্য আমি দুজন আরোহীকে দেখেছিলাম। তারা এখানে যাত্রা-বিরতি করেছিল। আর সে সেই

জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে হযরত বাসবাস এবং হযরত আদী থেমেছিলেন এবং নিজেদের উট বসিয়েছিলেন। সে বলে যে, তারা এখানে নিজেদের উট বসিয়ে পানি পান করেছিল এবং এরপর এখান থেকে প্রস্থান করে। আবু সুফিয়ান সেই জায়গায় আসে যেখানে উভয় সাহাবী উট বসিয়েছিলেন এবং তাদের উভয়ের উটের গোবর নিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকে। অর্থাৎ তার জানার ঔৎসুক্য ছিল, তাই গোবর ভেঙে দেখা আরম্ভ করে। ভাঙার পর উটের গোবর থেকে খেজুরের আঁটি বের হয়। তখন আবু সুফিয়ান বলে যে, খোদার কসম, এটিই মদীনাবাসীদের উটের খাবার। এরা সেখান থেকেই এসেছে। এরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা.) এর সাথী ও গুপ্তচর ছিল। অর্থাৎ যে দুই ব্যক্তি এসেছিল তারা মদীনা থেকে এসেছিল, আর এরা গুপ্তচর। উটের গোবর দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, তারা এখানে কেন এসেছিল। সে বলে যে, আমার মনে হয় তারা খুব কাছেই কোন জায়গায় রয়েছে। এরপর সে খুব দ্রুত সেখান থেকে কাফেলা নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়।

(কিতাবুল মাগাযিল লুআকদি, পৃঃ ৪০-৪১, আলিমুল কুতুব কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)

সে যুগেও সেসব আরবদের গুপ্তচরবৃত্তির এটিই রীতি ছিল আর কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়ার গভীর দক্ষতা ছিল। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, তিনি (সা.) যখন বদরের উপকণ্ঠে পৌঁছেন, তখন কোন একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে, যার উল্লেখ রেওয়ায়েতে নেই, তিনি (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নিজ বাহনের পিছনে বসিয়ে ইসলামী বাহিনী থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে যান। তখন তার সাথে এক বয়োবৃদ্ধ মরুবাসীর দেখা হয়, তার সাথে আলাপচারিতায় তিনি জানতে পারেন যে, কুরাইশ বাহিনী তখন বদরের খুব কাছে এসে গেছে। তিনি এই সংবাদ শুনে ফিরে আসেন আর হযরত আলী, যুবায়ের বিন আলআউয়াম এবং হযরত সাদ বিন ওক্কাসকে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে যাদের প্রেরণ করা হয়েছে তাদের মাঝে হযরত বাসবাসও ছিলেন। প্রথমে তারা গিয়েছিলেন কাফেলার সংবাদ আনার জন্য আর এখন যখন জানা যায় যে, সৈন্য বাহিনী আসছে, তাই সেই সৈন্য বাহিনীর সংবাদ আনার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছেন যাদের মাঝে ইনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বদর উপত্যকায় পৌঁছে হঠাৎ দেখেন যে, মক্কার কিছু লোক একটি ঝরনা থেকে পানি ভরছে। এই সাহাবীরা তাদের ওপর হামলা করে তাদের মধ্য থেকে একজন হাবশী কৃতদাসকে বন্দি করে আর মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসে। তখন মহানবী (সা.) নামাযে মগ্ন ছিলেন। সাহাবীরা যখন দেখলেন যে, মহানবী (সা.) নামাযে ব্যস্ত তখন তারা নিজেরাই সেই কৃতদাসকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা কোথায়। সে সেই সৈন্যদলের সাথে এসেছিল যারা বদরের যুদ্ধের জন্য আসছিল, কাফেলা সম্পর্কে তার জানা ছিল না। কাফেলা সম্পর্কে সে অনবহিত ছিল। সে উত্তরে বলে, আবু সুফিয়ানের কথা আমি জানি না। অবশ্য আবুল হাকাম অর্থাৎ আবু জাহল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়্যারা এই উপত্যাকার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করেছে। সাহাবীরা শুধু কাফেলার কথা জানতেন, তাদের ধারণা শুধু এটিই ছিল আর তাদের মনমস্তিষ্কে এ কথাই বসেছিল, তাইতারা ধরে নিয়েছেন যে, সে মিথ্যা বলছে আর জেনেশুনে কাফেলার খবর গোপন করতে চায়, যে কারণে কেউ কেউ তাকে প্রহার করে এবং উত্তম-মধ্যম দেয়। কিন্তু মার খেয়ে সে ভয়ে বলতো যে, ঠিক আছে বলছি। কিন্তু ছেড়ে দিলে সে আবার পূর্বের কথাই বলতো যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলার কথা আমি জানি না, অবশ্য আবু জাহল একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আর তারা নিকটেই রয়েছে। মহানবী (সা.) এসব কথা শুনে দ্রুত নামায শেষ করে সাহাবীদেরকে প্রহার করা থেকে বিরত করেন এবং বলেন যে, সে যখন সত্য বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর আর মিথ্যা বলা আরম্ভ করলে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি একান্ত কোমলভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সেই সৈন্যবাহিনী এখন কোথায়? সে বলে, এখন সম্মুখবর্তী টিলার পিছনে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের সংখ্যা কত? সে বলে, অনেক, কিন্তু সঠিক সংখ্যা আমি জানি না। তিনি বলেন যে, আমাকে এ কথা বল যে, তাদের খাবারের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করা হয়। সে বলে যে, দশটি। অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ছাড়াও পানাহারের জন্য এ পরিমাণ জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। তিনি (সা.) সাহাবীদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন যে, দশটি উট জবাই হওয়ার অর্থ হলো তাদের সাথে এক হাজার মানুষ এসেছে। আর বাস্তবেও এত সংখ্যক লোকই ছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবিঈন- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এম.এ., পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত সালেবা বিন আমর আনসারী। হযরত সালেবার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে। তার মায়ের নাম ছিল কাবশা, যিনি প্রসিদ্ধ কবি হাসসান বিন সাবেতের বোন ছিলেন। হযরত সালেবা বদরসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেসব সাহাবীদের একজন ছিলেন যারা বনু সালেবার মূর্তি বা প্রতিমা ভেঙেছিল। হযরত ওমরের খিলাফতকালে জিসর এর যুদ্ধের সময় তার মৃত্যু হয়েছে। জিসর এর যুদ্ধ ১৪ হিজরীতে হয়েছে, কিন্তু মতান্তরে, যেমন তাবরী-র মতে ১৩ হিজরীতে হয়েছে। এই যুদ্ধ ইরানীদের সাথে হয়েছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ অর্থাৎ হযরত আবু উবায়েদ-এর নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী আর বাহমন জাযেবিয়া-র নেতৃত্বে ইরানী বাহিনী ফোরাৎ নদীর তীরে মুখোমুখি হয়েছিল। আর নদী অতিক্রম করে যুদ্ধ করার জন্য একটি জিসর বা পুল বানানো হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে জিসরএর যুদ্ধ বলা হয়। কারো কারো মতে হযরত উসমানের খিলাফতকালে মদীনায়তার মৃত্যু হয়েছে। (রওযুল আনাফ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-১৫৯, তাসমিয়াহ ....., দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৬, সালেবা বিন মুহসিন (রাঃ), ৩৪০ সালমা বিন আসলাম (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (তারিখুল তিবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬, ওয়াকেয়াতুল ক্রুক্স দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত) (তারিখুল ইবনে খুলদুন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২ ..... দারুল ফিকর কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত সালেবা বিন গানামা। একটি রেওয়ায়েতে হযরত সালেবার নাম সালেবা বিন আনামাও বর্ণিত হয়েছে। হযরত সালেবার মায়ের নাম ছিল যহিরা বিনতে কায়েন। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের বনু সালেমা গোত্রের সাথে। হযরত সালেবা সেই সত্তর জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.) হাতে বয়আত করেছিল। তিনি যখন ঈমান আনেন তখন হযরত মায বিন জাবাল এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস, দুজনে সম্মিলিতভাবে বনু সালেমা অর্থাৎ নিজেদের গোত্রের প্রতিমা ভেঙে ফেলেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর পরিখার যুদ্ধে হুবায়রা বিন আবি ওহাব তাকে শহীদ করে। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সালেবা খায়বার এর যুদ্ধের সময় শাহাদত বরণ করেন। (আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৩৫, সালেবা বিন গানামা (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (ইসতিয়াব ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭ সালেবা বিন গানামা (রাঃ), দারুল জেল কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত জাবের বিন খালেদ। আনসারদের বনু দিনার গোত্রের সাথে হযরত জাবের এর সম্পর্ক ছিল। হযরত জাবের বিন খালেদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯৪, জাবের বিন খালেদ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত হারেস বিন নোমান বিন উমাইয়া। তিনি আনসারী ছিলেন। আনসারদের অউস গোত্রের সাথে হযরত হারেসের সম্পর্ক ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

আল্লাহ্‌র বাণী

"নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাইভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর। (হুজরাত: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?"

(সূরা হিজর: আয়াত: ৫৭)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং হযরত ফাওয়াদ বিন যাবায়ের এর চাচা ছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪১, হারিস বিন নোমান (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৪, হারিস বিন নোমান (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

এরপর রয়েছেন হযরত হারেস বিন আনাস আনসারী। তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে শরীক আর পিতা ছিলেন আনাস বিন রাফে। তার মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন আর মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেছেন। হযরত হারেসে-র সম্পর্ক অউস গোত্রের শাখা বনু আবদে আশআল এর সাথে ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। হযরত হারেস সেই গুটিকতক সাহাবীর একজন ছিলেন যারা ওহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এর সাথে গিরিপথে অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাকেন এবং শাহাদত বরণ করেন।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩৪, হারেস বিন আনাস (রাঃ), পৃঃ ৩৬২, আব্দুল্লাহ্ বিন জাবের (রাঃ) দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (আত্তবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৭, উম্মে শরীক (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত হুরায়েস বিন যায়েদ আনসারী। রেওয়ায়েতে তার নাম যায়েদ বিন সালেবাও বর্ণিত হয়েছে। খাযরাজের শাখা বনু যায়েদ বিন হারেসের সাথে হযরত হুরায়েসের সম্পর্ক ছিল। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যাকে আযান সম্পর্কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। তিনি ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১৭-৭১৮, হারেস বিন যায়েদ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) তার ভাইকেও আযানের শব্দ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত হারেস বিন আসআমাহ। হযরত হারেস বিন আসআমাহ এর সম্পর্ক আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে ছিল। তিনি বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শাহাদত বরণ করেছেন।

(ইসতিয়াব ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২ হারেস বিন আসমাহ্ (রাঃ) , দারুল জেল কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) হযরত হারেস এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনানের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৩, হারেস বিন আসমাহ্ (রাঃ), দারুল জেল কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

হযরত হারেস বিন আসআমাহ বদরের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.) এর সাথে যাত্রা করেন। তারা যখন আর-রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার ভিতর আর চলার শক্তি ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে মদীনা ফেরত পাঠান। কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই তার জন্য গনিমতের মাল-এ অংশ নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ কার্যত তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু একটি বিশেষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলেন,আর স্বাস্থ্য অনুমতি দেয় নি বা তখন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, যে কারণে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার সদিচ্ছা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মহানবী (সা.) তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন হযরত হারেস অবিচল ছিলেন এবং মহানবী (সা.) এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। তিনি উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগীরা মাখযুমীকে হত্যা করেন। আর তার 'সালাব' ছিনিয়ে নেন অর্থাৎ তার যে রণপোশাক এবং রণ সাজসরঞ্জাম নিয়ে নেন যাতে তার বর্ম, হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি ছিল। মহানবী (সা.) সেই সাজসরঞ্জাম তাকেই প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন ওসমান বিন আব্দুল্লাহ্-র মৃত্যু সংবাদ পান তখন তিনি বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, যিনি তাকে ধ্বংস করেছেন।

(আত্তবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৬, হারিস বিন সামাহ্ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারিস বিন সামাহ্ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

উসমান বিন আব্দুল্লাহ্ ভয়াবহ শত্রু ছিল এবং একজন মুশরেক ছিল, আর ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে এসেছিল। ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, আমার চাচা হামজা কোথায়। তখন হারেস তার সন্ধানে বের হন। তার ফিরে আসতে দেরী হয়ে যায়। তখন হযরত আলী বের হন। হযরত হারেসের কাছে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, হযরত হামযা শহীদ হয়ে গেছেন। উভয় সাহাবী ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে এই শাহাদতের সংবাদ দেন।

হযরত হারেস বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি উপত্যকা থেকে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, তুমি কি আব্দুর রহমান বিন অউফকে দেখেছ। আমি বললাম, জি হ্যাঁ দেখেছি, তিনি পাহাড়ের পাশেই ছিলেন, আর তার ওপর মুশরেকরা হামলা করছিল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য তার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার দৃষ্টি আপনার ওপর পড়ে, তাই আমি আপনার কাছে এসে যাই। তিনি (সা.) বলেন, ফেরেশতারা তার অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন অউফ এর নিরাপত্তাবিধান করছে। অপর রেওয়ায়েতে আছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, ফেরেশতারা তার পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। হযরত হারেস বলেন যে, আমি আব্দুর রহমান বিন অউফের কাছে যাই। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি আবার তার কাছে ফিরে যান। আমি দেখলাম তার সামনে সাতটি লাশ পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এদের সবাইকে কি আপনি হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, এই তিন জনকে আমি হত্যা করেছি, কিন্তু বাকীদের সম্পর্কে আমি জানি না যে, এদেরকে কে হত্যা করেছে। তখন আমি বললাম যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) সত্য বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার সাহায্য করছে। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারিস বিন সামাহ্ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

হযরত হারেস বি'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। যখন এই ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ সাহাবীদের শহীদ করা হয়, তখন হারেস এবং হযরত আমর বিন উমাইয়া উট চরানোর জন্য গিয়েছিলেন। সীরাত ইবনে হিশাম-এ এই দুইজন সাহাবীকে আমর বিন উমাইয়া এবং মুনযের বিন মুহাম্মদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক কোন কোন কিতাবে এ দুজনের নাম উল্লেখ রয়েছে যারা উট চরানোর জন্য বেরিয়েছিলেন। যাহোক এই রেওয়ায়েত অনুসারে এই দুজনই ছিলেন। তারা যখন নিজেদের অবস্থানস্থলে পৌঁছে দেখলেন যে, সেখানে পাখি বসে আছে তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের সাথিদের শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। হযরত হারেস হযরত আমেরকে বলেন যে, আপনার কী মতামত? তিনি বলেন যে, আমার মত হলো মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে যাই আর গিয়ে তাঁকে অবহিত করি। হযরত হারেস বলেন, আমি এই জায়গা থেকে পিছনে যাব না যেখানে মুনযেরকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব তিনি এগিয়ে যান এবং লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। (আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারিস বিন সামাহ্ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯, হাদিস বি'রে মঊনা, দার ইবনে হাজম কর্তৃক ২০০৯ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বকর বলেন, হযরত হারেসের শাহাদতের ঘটনা ঘটেছে শত্রুদের পক্ষ থেকে লাগাতার বর্শা -বৃষ্টির কারণে যা তার শরীরে ঢুকে যায় আর তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৫, হারিস বিন আস্সামাহ্ (রাঃ), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

আল্লাহ্ তা'লা সকল বদরী সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

আল্লাহ্র বাণী

এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর। (আন নাহল: ৬৯)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ্র বাণী

'এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যাতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না। (সূরা হিজর:আয়াত- ২২)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না।
তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ।
এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যায়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।*

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরূর

দ্বিতীয় দিন (দ্বিতীয় অধিবেশন) (৫ম পর্ব)

৫) রামা সোবোজি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাবেক সদর ও সাংসদ (ত্রিনালভেলি, তামিলনাড়ু) নিজের বক্তব্যে বলেন: আমি চেন্নাই থেকে আপনাদের এখানে জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছি। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এটি আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমি তামিলনাড়ুর ত্রিনালভেলির বাসিন্দা। জামাত সারা বিশ্বে প্রেমের যে বাণী প্রচার করছে তা প্রশংসনীয়। আজ এই বাণী পৃথিবীর ২১২ টি দেশে পৌঁছে গেছে। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাই যিনি প্রেমের এই বাণী সারা বিশ্বে প্রচার করছেন। আমি আপনাদের জামাতের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত। পৃথিবী আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পরমাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। পৃথিবীবাসী নিজের ধ্বংসের উপকরণ নিজেই সৃষ্টি করছে। কিন্তু আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার প্রসার ও পৃথিবীকে এই মহাধ্বংস থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় তৎপর। আমিও জামাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সমস্ত ধর্মের মানুষ যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, এখান থেকে ভালবাসা ও শান্তির বাণী নিয়ে ফিরবেন। আমি ত্রিনালভেলী জামাতেরও সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করি। আপনারা সৎপরায়ণ ও বিনয়ী মানুষ। আপনারা সন্ত্রাস ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। ইসলামও সবসময় ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছে। আপনাদের জামাত কুরআন করীমের শিক্ষা প্রচার করছে। জামাত কুরআন করীমের প্রদর্শনীরও আয়োজন করে থাকে। আপনাদের জামাত জনকল্যাণমূলক কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা করে এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে অবদান রাখে। এটি অনেক বড় এবং প্রশংনীয় কাজ। আমি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজ আপনাদের এই জলসায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি যারপরনায় আনন্দিত। আমি আপনাদের হুযুরের সঙ্গে কখনও সাক্ষাতের সুযোগ পাই নি, কিন্তু আমি তাঁর পবিত্র চেহারা ছবিতে দেখেছি। তাঁর চেহারা অত্যন্ত প্রশান্ত, অপূর্ব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। হুযুর আনোয়ারের পদযুগল তামিলনাড়ুর মাটিতে পড়লে আমরা ধন্য হব। আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

৬) সন্ত বাবা সন্তোখ সিং, অমৃতসর: তিনি বলেন, কাদিয়ানে পবিত্রভূমিতে প্রত্যেক ভাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম। আজ আপনাদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার সৌভাগ্য। মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভুতি পোষণ করে এসেছে। আমাদের গুরু এক মুসলিম ভাইয়ের দ্বারা হারমিন্দর সাহেবের গোড়াপত্তন করে এর দৃঢ় প্রমাণ দিয়েছেন এবং পৃথিবীর সামনে অসাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। মুসলিম সমাজ প্রত্যেক বিপদের সময় আমাদের পাশে দাঁড়ায় আর এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল উভয়ে এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে। আল্লাহ্

এরপর শেষের পাতায়...

সমস্ত ভাইদের উপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও করুণা প্রদর্শন করুন এবং এখানে আগম সমস্ত ভাইয়ের দোয়া গ্রহণ করুন। আপনারা এখানে আনন্দে সময় কাটান এবং আনন্দ সহকারে ফিরে যান। আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাকে এত বড় সম্মান দেওয়া হল এবং আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

৭) পরমজীত সিং কালসী (সর্বোত্তম শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত): তিনি সর্বপ্রথম সমস্ত অতিথি ও জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ ও সালাম জানান। তিনি বলেন, আপনারা মানবতার সেবার মহান কাজ করছেন। এটি সেই পবিত্র ভূমি যেখান থেকে মানবতার জয়গান উত্থিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদেরকেও আজ নিজেদের মধ্যে মানবতার চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং পারস্পরিক বিবাদ ও ভেদাভেদ মুছে ফেলে মিলেমিশে জীবনযাপন করা আবশ্যক। মানবতাই হল সব থেকে বড় ধর্ম।

৮) সুনীল জাখড় (সাংসদ, গুরুদাসপুর, এবং কংগ্রেস দলের সদর, পাঞ্জাব প্রদেশ) বলেন, কাদিয়ানের পবিত্র ভূমির এই জলসায় অংশগ্রহণ করার সম্মান লাভ করলাম। সমস্ত শ্রোতাদের স্বাগত জানাই যারা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে কাদিয়ানে জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। পৃথিবীতে এমন জলসা খুবই বিরল যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। এটি আজকে আমাদের সব থেকে বড় প্রয়োজন। মানবতার সেবা সব থেকে বড় সেবা, যা আপনাদের জামাত করছে। আমাদের পারস্পরিক মনমালিন্য দূর করে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে। আজ এই বাণীর প্রয়োজন যে, মানবতাই হল সব থেকে বড় বিষয়। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

৯) সুখ জিন্দার সিং রান্ধোয়ো (বিধায়ক, ডেরা বাবা নানক ও মন্ত্রী পাঞ্জাব সরকার) বলেন: আজ যে উত্তম পন্থায় ভালবাসা ও শান্তির বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়। আমরা সকলে সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার সৃষ্টি, কিন্তু পৃথিবীতে এসে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথ বেছে নিয়েছি। আমাদের সকলকে পরস্পর সম্প্রীতি সহকারে থাকতে হবে। মিথ্যা ও অন্যায়ে সামনে নতজানু হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং সত্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। আজ এই মহতি জলসায় এত দূর-দূরান্ত থেকে যে সমস্ত মানুষ এখানে এসেছেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলে সৌভাগ্যবান যারা ধর্মের উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন। এমন জাতি চিরকাল অমর হয়ে থাকে। এখানে এসে যে সমস্ত সদুপদেশ শোনা হয় সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমি আপনাদের সকলকে জলসার সাধুবাদ জানাই।

এরই সাথে দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন, প্রথম অধিবেশন

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সৈয়্যদ খালি আহমদ শাহ, নাযির আলা, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়া-এর সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় তিলাওয়াত করেন মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার, শিক্ষক জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান। তিনি সূরা হা-মিম সিজদার ৩৪-৩৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন আতাউল মুজীব লোন, নায়েব নাযির নশর ও ইশাত, কাদিয়ান।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নযম পরিবেশিত হয়।

'যিকরে খোদা পে জোর দে, যুলমতে দিল মিটায়ে যা'

নযমটি পরিবেশন করেন নাসরুম মিনাল্লাহ্ সাহেব, শিক্ষক জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য উপস্থাপিত হয় ' হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা- যুগের প্রয়োজন এবং ঐশী সমর্থনের আলোকে।'

দ্বিতীয় বক্তব্য উপস্থাপিত হয় ' তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বেদনাতুর উপদেশাবলী'। বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিরায আহমদ সাহেব, এডিশিনাল নাযির আলা, জুনুবি হিন্দ। তিনি বক্তব্যের প্রারম্ভে, পৃথিবীতে মজুত পারমাণবিক অস্ত্রের পরিসংখ্যন ব্যাখ্যা করে বলেন-

* বর্তমানে পৃথিবীতে তেইশ হাজার পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এগুলি এতটাই শক্তিশালী যে, গোটা পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যাকে এর দ্বারা কয়েকবার ধ্বংস করা যেতে পারে।

* এই তেইশ হাজার অস্ত্রের মধ্যে আড়াই হাজার অস্ত্র হাই এলার্টে রয়েছে। অর্থাৎ কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই সেগুলিকে নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

* বর্তমান যুগের একটি সাবমেরিনে যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত থাকে, তা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার থেকে তিনশ গুণ বেশি শক্তিশালী। আর একটি সাবমেরিনে যে পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তা চার কোটি মানুষকে মূহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা সকলে রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর অনুসারী। জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা সৈয়্যদানা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি অনুসরণ করেই পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষার জন্য অনেক দোয়া করছেন এবং প্রত্যেক স্থানে পৌঁছে এই উপদেশ দিচ্ছেন যে কিভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে, সংসদ ভবনে ভাষণের মাধ্যমে, নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি এই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও যুগ খলীফার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে পূর্বের থেকে বেশি তবলীগ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অনেক তবলীগ করুন। মানুষের কাছে পৌঁছে তাদেরকে জামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। শান্তির নামে জামাতকে পরিচিত করে তুলুন।

একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হুযুর আকদস আপনার সব থেকে বড় আশঙ্কা কি বিষয়ে? হুযর বলেন: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ যখন খোদার সন্ধান করবে, ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সেই সময়ের জন্য আহমদীদের কি যথেষ্ট প্রশিক্ষণ লাভ হয়ে গেছে? আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কি আমাদের সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে? আমরা পাঁচ ওয়াক্ত যথাসময়ে নামায পড়ছি? মানুষ যখন তৃতীয় বিশ্বের যুদ্ধের পর আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন এক সাফল্য লাভের পর তাদেরকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্য আমরা কি প্রস্তুত আছি? আমাদের নমুনা কি তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে? আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা কি নবাগতদেরকে ধর্মের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট?

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় জহীর আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশিনালা নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, জুনুবী হিন্দ। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'বর্তমান যুগের পরিস্থিতির নিরিখে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র গুরুত্ব।' তিনি বলেন, বর্তমানে সর্বত্র অরাজকতা, অস্থিরতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু দেশে জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে আবার কিছু দেশের সরকার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই কাজ করছে। সন্ত্রাসবাদী উপাদান নিজেদের বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অরাজকতার তৈরী করছে। আর নিরপরাধ মহিলা, শিশু ও বয়স্কদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এমন পরিস্থিতি আহমদীয়াতই পৃথিবীকে আজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার শেষ উপায় যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। শেষ এই অর্থে যে, যদি এরাও ব্যর্থ হয় তবে পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া নিশ্চিত। আর এই অর্থেও শেষ যে, যদি এর সফল হয় তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ধরণের ভয়াবহতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৃথিবীকে স্পর্শও করবে না।

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনকারীদের সুসংবাদ দান করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। নৈকট্য অর্জনের ময়দান শূন্য পড়ে আছে। সমস্ত জাতি জগত-প্রেমে নিমজ্জিত। আর যে বিষয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন সে বিষয়ের প্রতি পৃথিবীর মনোযোগ নেই। সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা এই পথ দিয়ে পূর্ণ শক্তিসহকারে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনের এবং খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার এটিই মোক্ষম সুযোগ।

(আল ওসীয়্যত, খণ্ড-২০ , পৃ: ৩০৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) আমাদেরকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-' পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে বসবাসকারী আহমদীর নিজের জন্য অনিবার্য করে নিন, তারা বছরে কমপক্ষে এক বা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এই কাজের জন্য ওয়াকফ করবেন। গুরুত্বসহকারে যাবতীয় শক্তি-সামর্থ প্রয়োগ করে প্রত্যেকের নিজেদেরকে ওয়াকফ করা উচিত। সে হল্যাণ্ডের হোক, বেলজিয়ামের হোক, ফ্রান্সের হোক বা ইউরোপের যে কোন দেশের অথবা আফ্রিকার ঘানা, বুর্কিনাফাসো, কিম্বা কানাডা, আমেরিকা বা এশিয়ার যে কোন দেশের হোক। যদি পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে প্রত্যেককে এখন বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে চিন্তা করা উচিত। প্রত্যেকের কাছে উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে এই বাণী পৌঁছে দিন। আর যেরূপ আমি বলেছি, পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন, কেননা, এখন আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন জাতি নিরাপদ থাকতে পারে না। অতএব এখন পৃথিবীকে রক্ষা করতে বিশেষ সংখ্যা বা লক্ষ্য অর্জন করার আর সময় হাতে নেই, বরং এখন জামাতগুলিকে এমন পরিকল্পনা করা উচিত

“সাহেবযাদী আমতুল হাফিয বেগম সাহেবার জীবনী”

মূল : মোহ্তরমা তৈয়্যেবা রাজ্জাক সাহেবা

সদর লাজনা হায়দ্রাবাদ, অনুবাদঃ সৈয়্যদ যাফরুল্লাহ্ , মুবাল্লিগ সিলসিলা

সম্মানীয়া সভাপতি মহাশয়া এবং আমার প্রিয় মায়েরা ও বোনেরা :

যেমনটি আপনারা শুনেছেন যে, আমাকে ইসলাম অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আকাশের একটি প্রজ্বলিত নক্ষত্রের শুভ স্মৃতিচারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমার উদ্দেশ্য হল হযরত সৈয়দা নওাব আমতুল হাফীয বেগম সাহেবা।এই জলসা সালানা আল্লাহ তালার নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি, যার বুনিয়াদি ইঁট আল্লাহ তালা স্বীয় হাতে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহর নিদর্শন হযরত সৈয়দা নওাব আমতুল হাফীয বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ, জ্ঞানের সত্যতার অন্তর্গত। মহতরমা আমতুল কুদ্দুস বেগম সাহেবা তার কবিতামালার মধ্যে কি সুন্দরই না বর্নণা করেছেন :

মসীহ মাউদ (আ:) এর কন্যা কলিজার টুকরো
হউক হাজার হাজার আশীষ ও কল্যান তার উপর
পবিত্র মনের ও উন্নত চরিত্রের উত্তরাধিকারি,সম্মানিত পুত্রী
সৈয়্যেদার জীবন, মাহদীর সুন্দর চোখের জ্যোতি

হযরত সৈয়দা নওাব আমতুল হাফীয বেগম সাহেবার জন্ম হযরত ইমাম মাহদী (আ:) এর ঘরে ২৫ জুন ১৯০৪ হয়েছিল।তাঁর মায়ের নাম সৈয়দা নুসরত জাহাঁ বেগম। তিনি হজরত মসীহ মাউদ (আ:) এর সন্ত ানদের মধ্যে সবথেকে ছোট ছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বে আল্লাহ তালা যুগের ইমাম (আ:) কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, دخت کرام পবিত্র কন্যা” (১০মে ১৯০৪)

کرام এর বহু বচন হল کریم যার অর্থ হল সুসম্মানের অধিকারী, উচ্চ পদাধিকারী, দানী ব্যাক্তি। হজরত মসীহ মাউদ (আ:) কে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, একটি মেয়ে(পুত্রী) হবে,যে সমস্ত দিক দিয়ে সুসম্মান্নিত মেয়ে হবে আর সেই দিন যখন সে সম্মান্নি ত মেয়ে জন্ম নিল হজরত মসীহ মাউদ (আ:) স্ব ীয় খাতাতে এই লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, আজ ২৫ জুন ১৯০৪ শনিবারের রাত অর্থাৎ জুম্মার দিনগত রাত। হিজরী ১০ রবি উস্ সানী ১৩২২ আমার ঘরে কন্যা জন্ম নিয়েছে,তার নাম আমতুল হাফীয রাখা হয়েছে।এই সেই কন্যা যার সম্পর্কে ইলহাম হয়ছে। واللہ مخرج ما کنتم تکتمون (তাযকিরা পৃষ্টা : ৪১৬, টীকা)

হজরত মসীহ মাউদ (আ:)এটিকে আল্লাহ প্র দত্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হিসাবে এরকম ভাবে বর্ণণা করেছেন যে, চল্লিশতম নিদর্শন হল যে,এই কন্যার পর আরও এক কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যার শব্দ এ রকম ছিল, دخت کرام সুতরাং সেই ভবিষ্যদ্বাণী ‘আল্ হাকাম’, ‘আল্বদর’ পত্রিকাতে অথবা দুটোর একটাতে প্রকাশ করা হয়েছিল আর তার পর কন্যা জন্ম হয় যার নাম আমতুল হাফীয রাখা হয়েছে।

(হাকীকাতুল ওহী পৃ: ২১৮)

সুতরাং ‘দুখতে করামের’ ভবিষ্যত বানী এই বর্ণণা করে যে,আল্লাহ তালা তাঁকে দীর্ঘজীবি করবেন যাহাতে তিনি স্বীয় চারিত্রীক গুনাবলীর দ্বারা প্রমান করতে পারেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে করীমানা(সুসম্মানীয়) চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে হযরত মসীহ মাউদ(আ:) এর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন প্রদান করেছেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত জীবন নিজের উত্তম আদর্শ দ্বারা ”দুখতে করামের” সুপ্রমান দিয়েছেন।হযরত মসীহ মাউদ(আ:) তাঁর নাম আমতুল হাফীয রেখেছেন যার মধ্যে এই ভবিষ্যত বানী ছিল যে, আল্লাহ তালা তাকে স্বীয় সংরক্ষনের ছায়ায় রাখবে।এই নামের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি ও ছিল যে হযরত মসীহ মাউদ(আ:) এর মৃত্যুর পর তিনি আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।সুতরাং তাঁর সমস্ত জীবন এটা প্রমান করে দেয় যে, খুদা তালা সর্বদা তাঁর হিফাযত ও সাহায্য করেছেন।

তিনি খুবই সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী এবং হযরত মসীহ মাউদ(আ:) এর মুখ সাদৃশ ছিলেন।তিনি অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং ছোটবেলায় খুবই কথা বলতেন। সুতরাং হযরত মসীহ মাউদ(আ:) তাঁর সম্পর্কে খুবই সুন্দর ভাবে বলেছেন যে ”আমার কন্যা আমতুল হাফীয ও খুবই কথা বলেন”

(আলহাকাম খন্ড ১১)

তিনি হযরত মসীহ মাউদ(আ:) এর বার্ধক্য সময়ের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, হযরত মসীহ মাউদ (আ:) তাঁর উপর গর্ব করতেন। একদা হযরত মসীহ মাউদ (আ:) কোথাও যাচ্ছিলেন, হযরত আম্মাজান বলে পাঠালেন যে, আমতুল হাফীয কাঁদছে এবং সঙ্গে যাওয়ার জিদ ধরেছে।তিনি (আ:)তাকে ডেকে পাঠালেন এবং কোলে করে নিয়ে গেলেন।

হযরত নওয়াব আমতুল হাফীয সাহেবা তখন শুধু মাত্র ৪ বৎসরের ছিলেন,তখন হযরত মসীহ মাউদ(আ:) এর মৃত্যু বরণ করেন।হজরত আম্মাজান এত পরিমান দু:খিত ছিলেন যে বলেন তুমি এত ছোট বয়সে তোমার মহান বুযুর্গ পিতার (ভালোবাসা) থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে। হজরত আম্মাজান তাঁ কে দ্বিগুন ভালোবাসা দিতেন। তিনি (রা:) তাঁর বাপ ও ছিলেন এবং মা ও।

তিনি(রা:) খুবই আদরের সহিত তাকে লালন পালন করেছিলেন আবার যখন সেই সময় আসল যখন আল্লার নির্দেশ পূর্ণ কর লেন, তখন তাঁর জন্য তাকরীব-এ-আমীন অনুষ্ঠিত করলেন। তাঁর(রা:) এর বড় ভা্ই হজরত মুসলেহ মাউদ (রা:) তাঁর আমীন এর প্রোগ্রামে একটি নজম লিখেছিলেন,যার দু একটি এখানে তুলে ধরা হল।

হাফীয যিনি আমার ছোট বোন
না এখন ও পযর্ন্ত সে হয়েছে ইহাতে রঙ্গীন
হল যখন সাত বছরের তো খুদা
পরিয়েছে তাকেও কিছু মুকুট
আল্লাহর কালাম তাকে পরানো হয়েছে কুরানের বাগানের ফুল
বানিয়েছে (কালামে মাহ্মূদ)

অর্থাৎ হজরত মসীহ মাউদ (আ:) এর মৃত্যুর সময় তিনি মাত্র ৪ বছরের ছিলেন। আর সাধারনত: এই বয়সে ছোট বাচ্চাদের ভুলকে বড়রা অতটা ধ্যান দেয়না কিন্তু হজরত মসীহ মাউদ (আ:) তাঁর এই বয়সে ও তরবীয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সুতরাং একবার কোন এক কাজের মেয়ের থেকে শুনে গালি দেন। তা শুনে হজরত মসীহ মাউদ (আ:) খুবই দু:খ প্রকাশ করেন এবং নারাজ হয়ে বলেন যে, যদি বাচ্চাদের মুখে অল্প বয়স থেকে নোংরা শব্দ বের হয় তাহলে অনেক সময় মৃত্যুশয্যায়ও মুখ থেকে ঐ শব্দ এসে যায়।

শ্রোতা মন্ডলী ! দেখুন খুদার প্রিয় বান্দা কিভাবে নিজ সন্তানদের তরবীয়াতের প্রতি খেয়াল রাখেন।

হজরত নওাব আমতুল হাফীয বেগম সাহেবা (রা) কাদিয়ান দারুল আমানের দারুল মসীহতে জন্ম গ্রহন করেন আর এখানেই তিনি তার বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। হজরত মসীহ মাউদ (আ:) মৃত্যুর পর তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর (আ:) এর কামরাতে থাকতেন। হজরত আম্মাজান(রা:) এর পালং দালানে থাকত, যেখান থেকে বায়তুদ দোয়ার সিড়িতে ওঠা হয়। তিনি দালানে খেলতেন, অনেক সময় তিনি খেলতে খেলতে হজরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের (রা:) দরসে চলে যেতেন আর হজরত খলীফাতুল মসীহ তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে দরস দিতেন। এই হল তাঁর পবিত্র ও সরল বাল্যকাল।

শ্রোতা মন্ডলী! হজরত নওাব আমতুল হাফীয বেগম সাহেবার জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা তার রক্তে ছিল। পৃথিবীতে চোখ খোলার সাথে সাথে তাঁর মহান পিতা হজরত মসীহ মাউদ (আ:) পড়তে লিখতে দেখেছিলেন। তিঁনি খুব সুন্দর কবি ও ছিলেন।

হজরত মুসলেহ মাউদ(রা:) যুগেই তাঁর বিবাহ হজরত নওাব মহম্মদ আব্দুল্লাহ খান সাহাব(রা:) সাথে হয় যিনি মালেরকোটলা(রাজ্যের) রিয়াসতের নবাব খানদানের একজন। যখন তাঁর বয়স ১৩ বছর হয় তখন যদি তুমি এই মুশকিল সহ্য করতে পার তাহলে এই সম্পর্কের দিকে ধ্যান দিও, নচেৎ এটাই উত্তম হবে তুমি না করে দাও। দ্বিতীয় এই যে, সম্পর্কের পরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অথবা তাঁর বংশধরদের সাথে নিজেদেরকে অনেকে সমকক্ষ মনে করে যার মাধ্যম দিয়ে নিজেকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়। চিন্তার বিষয় এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্ক কেন চাওয়া

যুগ ইমামের বাণী

খোদা এই জামাতকে এরূপ একটি জাতি বানাতে চান, যাদের আদর্শ দেখে মানুষ খোদাকে স্মরণ করবে এবং যারা তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, পৃষ্ঠা: ৯২)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 14 Mar, 2019 Issue No.11

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১০ পাতার পর.....

যাতে প্রত্যেক আহমদী, আর প্রত্যেক ব্যক্তি এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৪ঠা জুন, ২০০৪ সাল)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* ডক্টর উসামা আব্দুল আযিম সাহেব অফ মিশর আরবী ভাষায় নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন যার উর্দু ধারাভাষ্য দেন যুক্তরাজ্যের তাহের নাদীম সাহেব। উসামা আব্দুল আযীম সাহেব বলেন: জীবনে প্রথম কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হচ্ছে। আমার মতে কাদিয়ান আসার আমার জন্য অসম্ভব বিষয়গুলির একটি ছিল। কেননা, দীর্ঘকাল আমি জামাত আহমদীয়ার ঘোর বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এই বিরোধীতার কারণে আমাদের দেশে জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চলছে যার কারণে আমি এবং আমার মত যুবকদের মনে জামাতের বিরুদ্ধে এই অবধারণাই ছিল যে, এটি ইসলাম বিরোধী এক নতুন ধর্ম আর এই জামাতের সদস্যরা আঁ হযরত (সা.)-এর খতমে নবুয়তের বিশ্বাসী নই। যেরূপ প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে যে, মিথ্যা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। আমার সঙ্গেও অনুরূপ হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করি। আমি তাঁর পুস্তকাবলীতে সত্য, খোদা তা'লা এবং তাঁর রসুলের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার সমাহার দেখেছি। তাঁর রচনা এবং রচনার মধ্যে থাকা সত্যের জ্যোতির সামনে মিথ্যার সমস্ত প্রতিমা খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়েছে। আরও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমি খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং ২০১৪ সালে পবিত্র রমযান মাসের এক রাত্রিতে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় ও বিগলন সহকারে দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে মির্যা গোলাম আহমদ সম্পর্কে অবহিত কর যে, সত্যিই কি তিনি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যার জন্য সমগ্র জাতি প্রতীক্ষায় রয়েছে? খোদা তা'লার কৃপা বর্ষিত হল এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে শীঘ্রই উত্তর দেওয়া হল। আমি অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় অত্যন্ত জোরালো ও প্রতাপান্বিত কণ্ঠে এই শব্দাবলী শুনতে পাই।----- ' আমি তাঁকে শক্তিশালী বাদশাহর নিকট সত্যের মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করেছি।' এই আওয়াজ আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে আলোড়িত করে তুলেছিল। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, যেরূপ আমি সূর্যকে দেখার পর তার আলো সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারি না, অনুরূপে এক মূহুর্তের জন্যও আমি সেই শব্দাবলীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারি না। অতঃপর খোদা তা'লা আমাকে সেই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার তৌফিক দান করেছেন আর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.)-এর হাতে বয়াত করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং এই পবিত্রভূমি দর্শন করার সৌভাগ্যও দান করেছেন, যে ভূমিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিচরণ করেছেন। আর আমি একথাও বলতে চাই যে, এই জনপদে এসে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি নবী করীম (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাসের হাতে ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে যেন, কাদিয়ানের আকাশে-বাতাসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এখন ছড়িয়ে আছে। তিনি (আ.) যখন ইসলামের বাণী নিয়ে এর অলিতে গলিতে বিচরণ করতেন, সেই সময়কার তাঁর পদধ্বনিও আমার কানে বাজছে। (ক্রমশ.....)

১১ পাতার পর.....

হয়? পরিষ্কার কথা হল এই যে যখন তাঁর কাপড়ও বরকতময় তাহলে তাঁর কলিজার টুকরো কেন বরকতময় হবে না। (আসহাবে আহমদ খণ্ড ১২)

শ্রোতামণ্ডলী!

হযতে সৈয়্যেদা নবাব আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবা খুবই প্রেম-প্রীতি পূর্ণ ও সেবা নিবৃত্ত স্ত্রী প্রমাণিত হয়েছে। তার স্বামী যদি তার সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন ও খেয়াল রাখতেন তিনিও নিজের স্বামীর ভালোবাসার প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দিতেন কখনই এই ভালোবাসার মিথ্যা সুযোগ নেন নি। প্রাথমিক অবস্থায় তার স্বামীর আয়ের কোন উৎস ছিল না, কিছু মাসিক পকেট খরচ তার পিতা নবাব মহম্মদ মহম্মদ আলী খান সাহেবের তরফ থেকে তার স্বামী পেতেন। সৈয়্যেদা আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবাসেই পয়সাতেই খুবই সুন্দরভাবে সংসার চালাতেন। কখনই নিজের স্বামীর উপর বোঝা চাপায় নি। তার ভিতরে আত্মঅভিমান ও খুদ্দারী কুটে কুটে ভরা ছিল। খোদ ব্যতিত অন্য কারোর কুপাতলে থাকা তার খুবই অপছন্দ ছিল। সুতরাং ক্রমাগত দোয়া ও পরামর্শের ফলে তার স্বামী সিন্ধুতে নিজের জন্য সাময়িক কৃষি জমি নেওয়ার সাফল্য অর্জন করেন। এই জায়গাটি পাওয়ার জন্য তার স্বামীকে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছিল। আর অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। হযরত সৈয়্যেদা আমতুল বেগম হাফিজ সাহেবা তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, নিজের অলঙ্কার দিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণ রহীম আর সে ভালোবাসাকে পছন্দ করে। সুতরাং এই জায়গায় যা হযরত আম্মাজান এবং সৈয়্যেদা আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবার দোয়ার ফলে পেয়েছিলেন তা খুবই বরকতময় প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করে দেয়।

১৯৪৮ সালে হিজরতের পর হজরত নবাব মহম্মদ আবদুল্লাহ্ খান সাহেব হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়। এটা এতটাই মারাত্মক ছিল যে, ডাক্তার তার বাঁচার কোন সম্ভাবনা দেখছিল না। হজরত বেগম সাহেবা দিন-রাত সেবা করেন। ডাক্তাররা এই কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, এই রকম সেবা কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সও করতে পারত না। তার প্রিয় স্ত্রী তার সেবার পুরো অধিকার আদায় করেছে। স্বামীর অসুস্থতায় তিনি টাকা পয়সাও জোগাড় করতেন এবং বাচ্চাদের তালিম ও তরবিয়তের দিকেও ধ্যান দিতেন। স্বামীর অসুস্থতার সময় তিনি অনেক মাস ঘরের বাইরে বের হন নি। একবার অনেক দিন পর যখন ঘর থেকে বের হলেন সূর্যের আলোর অভ্যাস না থাকার কারণে তার চোখের তারা বন্ধ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ্! এই সুন্দ আদর্শ আমাদের হযতে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কন্যাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যন্ত্রনাদায়ক অসুস্থতার পর ১৯৬১ সালে হজরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব মৃত্যুবরণ করেন।

হজরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব তার মৃত্যুর পূর্বে একটি ওসীয়্যত করেন। সেই ওসিয়্যতে লেখেন যে, "আমি এই স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে, যখন আমি আমার স্ত্রীর ভালোবাসা এবং আনুগত্যকে দেখি তো বেশিরভাগ সময় অবাক দুনিয়ায় হারিয়ে যেতাম ও তিনি রাজকন্যা স্বরূপ নিজের মধ্যে রাখতেন। তার মধ্যে হিংসা ও বিদ্রুপ বিন্দু পরিমাণও ছিল না কিন্তু আভিজাত্য তার মধ্যে দেখতাম যা ঈর্ষা থেকে উর্দ্ধে.....তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। যার সঙ্গে কথা বলতেন তাকে নিজের মুরিদ বানিয়ে নিতেন। স্বামীর উপরে কখনই অযথা কোন বোঝ চাপান নি। কিন্তু তার স্বামীর চিন্তা-ভাবনা দুঃখতে সর্বদা ভালোবাসার প্রিয় সাথীর মত কাজ করতেন। বাচ্চাদের তালিম তরবিয়তে তিনি নিজেই এক দৃষ্টান্ত। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে আনন্দ উপভোগ করতেন। (ক্রমশ.....)

আল্লাহ্‌র বাণী

"এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে। (আন-নাহল, আয়াত: ৬৭)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

হাদীস

" নামায ত্যাগ করা মানুষকে শির্ক ও কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir